সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সুস্পষ্ট করণীয়:

ভোটার তালিকার সঠিকতা নিশ্চিতকরণ, সীমানা পুনর্নির্ধারণ, ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন, নির্বাচনী ব্যয়হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে শুরু করে ২৮ জানুয়ারি ২০১৯-এর, অর্থাৎ সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। আর সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে নির্বাচন মানেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। শুধু তাই নয়, নির্বাচন বলতে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনও, যেখানে ভোটার অনেক প্রার্থীর মধ্য থেকে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেবে। কারণ 'নির্বাচন' মানেই 'চয়েস' বা বিকল্পের মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ। তাই প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের এবং এ লক্ষ্যে কমিশনকে সকল প্রতিযোগীর জন্য সমান সুযোগ বা 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে শুধুমাত্র নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে সকলের জন্য সম-সুযোগ নিশ্চিত করলেই চলবে না, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকেই তা করতে হবে। এ লক্ষ্যে কমিশনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট করণীয় রয়েছে।

গত ২২ আগস্ট সুজন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি গোলটেবিল বৈঠকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ছিলো: সাংবিধানিক বিধানের যথার্থতা; আইনি কাঠামোর সংস্কার (যেমন: না-ভোটের বিধানের অন্তর্ভূক্তি, অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমাদান, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন, ভোট পুনর্গণনার দায়িত্ব কমিশনের এখতিয়ারে আনয়ন); নির্বাচনী বিধি-বিধানের কঠোর প্রয়োগ (যেমন: রাজনৈতিক দলের অঙ্গ, সহযোগী সংগঠন ও বিদেশি শাখার বিলুপ্তি, তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করার এবং সেটি থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন দেওয়ার বিধান); ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন; নির্বাচনের সময়ে নিরাপত্তা বিধানের জন্য শুধুমাত্র পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির (যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ রয়েছে) ওপর নির্ভর না করে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি 'সিকিউরিটি প্ল্যান' তৈরি; নির্বাচনকালীন সময়ে সেনা মোতায়েনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞায় সেনা বাহিনীর অন্তর্ভূক্তি; দ্রুত নির্বাচনী বিরোধের মীমাংসা; প্রধান নিবাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

আমরা আজ চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যেমন: ভোটার তালিকার সঠিকতা নিশ্চিতকরণ, যথাযথভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণ, ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন এবং নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এ আলোচনা আমরা একটু গভীরভাবে করতে চাই।

ভোটার তালিকার সঠিকতা নিশ্চিতকরণ:

নির্ভুল ভোটার তালিকা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রধানতম পূর্বশর্ত। আর এই ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ২০০৪ সাল থেকে সুজন এবং ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবি তুলে ধরে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে সেনাবাহিনীর সহায়তায় একটি প্রায় নির্ভুল ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়, যে তালিকায় পুরুষের তুলনায় ১৪ লাখের বেশি নারী ভোটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ তখন জেন্ডার গ্যাপ ছিলো +৩.৬১%। আমাদের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষের হার প্রায় সমান সমান। এছাড়াও আমাদের প্রায় এক কোটি নাগরিক বিদেশে কর্মরত, যাদের প্রায় সবাই পুরুষ এবং অধিকাংশই ভোটার নন। তাই আমাদের ভোটার তালিকায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হওয়ারই কথা।

সাল	জেন্ডার গ্যাপ (নারী)
২০০৭-০৮	+৩.৬১%
২০০৯-১০	-২৩%
২০১২-১৩	-৩৩%
২০১৩-১৪	-১১%
২০১৪	-১৭%
২০১৫-১৬	-২৬%

কিন্তু ২০০৮-এর পরে ভোটার তালিকায় হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক নারী অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে, যার ফলে 'জেন্ডার-গ্যাপ' নারীর জন্য ক্রমাগতভাবে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। যেমন: ২০১৫-১৬ সালের তথ্যানুযায়ী পুরুষের তুলনায় ২৬ শতাংশ কম নারী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও তালিকাভূক্তির কথা থাকলেও, সাম্প্রতিক অতীতে তথ্য সংগ্রহকারীরা বাড়ি বাড়ি যাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। কখনও কখনও হালনাগাদের সময় বর্ষাকালকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই ঋতুতে হালনাগাদ করলে বন্যাপ্রবণ ও চরাঞ্চলে ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় নতুন ভোটার বিশেষত নারী ভোটার বাদ পড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন হলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ:

নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কয়েকটি সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে তা করা হয়, যার একটি হলো সংসদীয় আসনগুলোতে জনসংখ্যায় যতদূর সম্ভব সমতা আনা। বিদ্যমান ১৯৭৬ সালের সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ আইনানুযায়ী, সর্বশেষ আদমশুমারির পরে এবং প্রত্যেক জাতীয় নির্বাচনের আগে সীমানা পুনর্নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে (ধারা: ৮)।

তবে গণমাধ্যমের প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে। এই আইনটি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান সীমানাতেই অর্থাৎ ২০১৩ সালের নির্ধারিত সীমানার ভিত্তিতেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত ২০১৩ সালের পুনর্নির্ধারিত সীমানা নিয়ে অনেকগুলো গুরুতর অভিযোগ ও সমস্যা রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর খোদ সরকারি দলের একাধিক সংসদ সদস্য বিগত রকিবউদ্দিন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ করা হয় যে, আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলামের মৌখিক অনুরোধে তার নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-২ আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয় (*প্রথম আলো*, ৩১ *মার্চ* ২০১৩)। এ পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে ঢাকার অন্য ১৫টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে হয়েছে এবং ঢাকার আটজন সংসদ সদস্য এর বিরুদ্ধে কমিশনে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে ঢাকা-৭ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন অভিযোগ করেন, 'নির্বাচন কমিশন আমাদের সরকারের প্রভাবশালী একজন প্রতিমন্ত্রীর স্বার্থরক্ষা করে ঢাকার আসনের সীমানা বিন্যাসের প্রস্তাব করেছে। একজনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ১৫ জনের স্বার্থহানি করাটা অন্যায়' (*প্রথম আলো*, ৩১ *মার্চ* ২০১৩)। সরকার দলীয় আরেকজন সংসদ সদস্য জাকির হোসেন এক নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কুড়িগ্রাম জেলার নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজে পক্ষপাতদুষ্ট হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কমিশনের শুনানিকালে তিনি দাবি করেন, 'কমিশন সচিবালয়ের নীচতলায় বসে কুড়িগ্রামের আসন তছনছ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। একজন নির্বাচন কমিশনের ছেলে ও জামাতা কুড়িগ্রাম থেকে নির্বাচন করতে চাইছেন। তাদের জন্য পছন্দসই সীমানা সাজাতে কুড়িগ্রামের আসনগুলোতে হাত দিয়েছেন এই নির্বাচন কমিশনার'। প্রায় একই অভিযোগ করেন এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জাপা নেতা গোলাম হাবিব ও চিত্র পরিচালক বাদল খন্দকার (*কালের কণ্ঠ*, ২৪ এপ্রিল ২০১৩)।

এছাড়াও ভোটার সংখ্যার যতটুকু সম্ভব সমতা আনা নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণে অন্যতম মানদণ্ড হলেও ২০১৩ সালের সীমানা পুনর্নির্ধারণে তা মানা হয়নি। ফলে সীমানা পুনর্নির্ধারণের কারণে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালের সংসদীয় এলাকাগুলোর ভোটার তালিকার পার্থক্য আরও বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল আট কোটি ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৯৮ জন (*প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি, ২০১৩), ফলে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দুই লাখ ৭০ হাজার ২৯০ জন। তুলনামূলক চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ওই নির্বাচনে ১১১টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ৩৯টি আসনে +১১-২০ শতাংশের মধ্যে, ৬৭টি আসনে -১১-২০ শতাংশের মধ্যে, ১৯টি আসনে +২১-৩০ শতাংশের মধ্যে, ২৬টি আসনে -২১-৩০ শতাংশের মধ্যে, ২২টি আসনে +৩১ শতাংশের বেশি এবং ১৬টি আসনে -৩১ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ গত নির্বাচনে ১১১টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ১০৬টি (৩৯ + ৬৭) আসনে +১১-২০ শতাংশের মধ্যে এবং বাকী ৮৩টি (১৯+২৬+২২+১৬) আসনে ±২১ শতাংশের উর্ধ্বে।

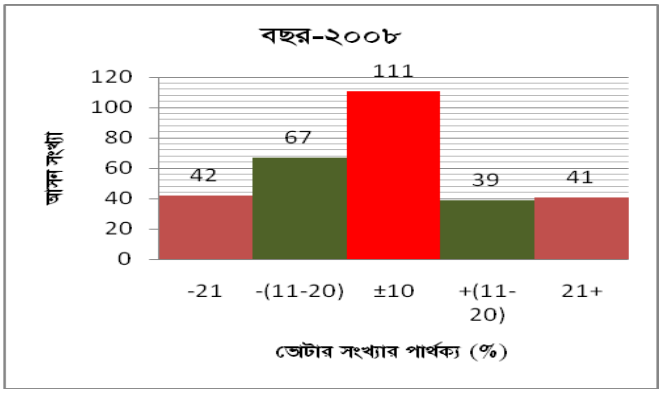

পক্ষান্তরে, ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, আমাদের মোট ভোটার সংখ্যা নস্ট কোটি ২১ লাখ ২৯ হাজার ৮৫২ জন, ফলে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা প্রায় তিন লাখ সাত হাজার ১০০ জন। তুলনা করলে দেখা যায় যে, এই নির্বাচনে ১০৬টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ৪১টি আসনে +১১-২০ শতাংশের মধ্যে, ৫১টি আসনে -১১-২০ শতাংশের মধ্যে, স্থ৬টি আসনে +২১-স্পষ্ট্র শতাংশের মধ্যে, ২৬টি আসনে -২১-৩০ শতাংশের মধ্যে, ৩১টি আসনে +৩১ শতাংশের উর্ধ্বে এবং ২৯টি আসনে -৩১ শতাংশের উর্ধ্বে। অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনে ১০৬টি আসনের ভোটার সংখ্যা হবে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ৯২টি (৪১+৫১) আসনের ±২০ শতাংশের মধ্যে এবং বাকি ১০২টি (১৬+২৬+৩১+২৯) আসনের ±২১ শতাংশের উর্ধ্বে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে ২০০৮ সালে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা থেকে ±২১ শতাংশের উর্ধ্বের ভোটার সম্বলিত আসন সংখ্যা ছিল ৮৩, সেখানে ২০১৩ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী তা এসে দাঁড়িয়েছে ১০২-এ। অর্থাৎ ২০১৩ সালের সীমানা পুনর্নির্ধারণের ফলে সংসদীয় আসনগুলোর মধ্যে ভোটার সংখ্যার দিক থেকে ২০০৮ সালের তুলনায় আরও অসমতা বেড়েছে। তাই ২০১৩ সালের নির্ধারিত সীমানার ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে বাধ্য।

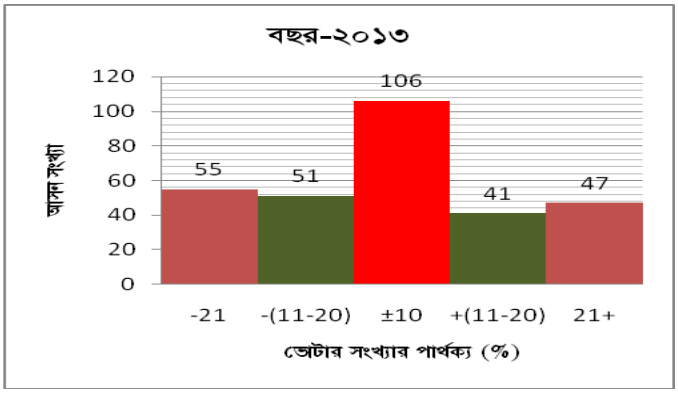

ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ২৪ মে ২০০৫ তারিখে '*আব্দুল মোমেন চৌধুরী ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ*' (২০০৫ সালের রিট পিটিশন নং ৫৭) মামলায় এক যুগান্তকারী রায় দেন। রায়ে আদালত নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী থেকে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আট ধরনের তথ্য হলফনামা আকারে সংগ্রহ এবং এগুলো গণমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এর পর থেকে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের বিভিন্ন উপ-নির্বাচনে রায়ের নির্দেশনা বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক এই রায়কে ভণ্ডুল করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে জালিয়াতির মাধ্যমে আবু সাফা নামক জনৈক ব্যক্তিকে (যাকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি) দিয়ে আপিল করানো হলেও 'সুজন'-এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আইনি পদক্ষেপে সুপ্রিম কোর্টে তা প্রতিহত করা সম্ভব হয় এবং হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করে দেওয়া আপিল বিভাগের রায় একইদিনে রিকল বা প্রত্যাহার করতে হয়।

প্রসঙ্গত, তথ্যপ্রাপ্তির এই অধিকার পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হলেও, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা বাদ রাখা হয়েছে। আমরা মনে করি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও প্রার্থী কর্তৃক হলফনামা প্রদানের বিধান যুক্ত হওয়া উচিৎ। বিষয়টি নিয়ে অ্যাডভোকেসির পাশাপাশি সুজন আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হলফনামার মাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তির দাবিতে করা মামলার শুনানি শেষে রায় ঘোষণার দিনে হঠাৎ করেই বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতির আপিল বিভাগে নিয়োগ পাওয়ায়, মামলাটি এখনও সুরাহা হয়নি।

উচ্চ আদালতের রায়ে সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে এসব তথ্য ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও, কমিশন তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন তথ্য বিতরণের কাজটি শুরু করলেও, পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপ-নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রায় সব নির্বাচনেই সাধ্যানুযায়ী হলফনামায় প্রদত্ত এসব তথ্যের তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে তা বিতরণ করেছি, ভোটারদের কাছে যা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। (দেখুন: http://votebd.org)। গণমাধ্যমও এখন একাজে এগিয়ে এসেছে এবং আনন্দের কথা যে, এটি এখন একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চ আদালত কর্তৃক হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের রায় এবং বিষয়টি আইনে সন্নিবেশনের পূর্বেই ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে সুজন-এর নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ এবং তা একত্রিকরণ করে ভোটারদের মাঝে বিতরণের মধ্য দিয়ে ভোটারদের ক্ষমতায়নের এই কাজটি শুরু করা হয়।

হলফনামার বিধানটি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে যদি নির্বাচন কমিশন এগুলোর সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়; এবং সে ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে। আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন থেকেই অনেক অরাজনৈতিক ব্যক্তি, বিশেষত ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক অঙ্গনে উড়ে এসে জুড়ে বসতে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের কেউ কেউ প্রচুর অর্থকড়ি ব্যয় করে মনোনয়ন বাণিজ্য ও ভোট কেনা-বেচার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেন এবং সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে আরও বিত্তশালী হন। এ প্রক্রিয়ায় আমাদের রাজনীতি আজ একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু আরপিও'র ১২ ধারা অনুযায়ী হলফনামায় তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য দিলে মনোনয়নপত্র বাতিল এবং নির্বাচিত হলে নির্বাচন বাতিল হবার কথা, তাই নির্বাচন কমিশন হলফনামার তথ্য খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলে অনেক বসন্তের কোকিল ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকেই নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রাখা যাবে। ফলে আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া কলুষমুক্ত হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হবে। তাই আমরা মনে করি যে, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করা আবশ্যক।

এছাড়া হলফনামার ছকটিও অসম্পূর্ণ এবং এতে গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে হলফনামায় বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করার দাবি করছি: ১. প্রার্থীর বয়স; ২. বিদেশি নাগরিকত; ৩. আয়ের উৎসের বিস্তারিত বিবরণ; ৪. কারা প্রার্থীদের ওপর নির্ভরশীল তার বিস্তারিত বিবরণ; ৫. সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কি না ইত্যাদি। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে হলফনামায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কমিশন আনতে পারে। একইসঙ্গে কমিশনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কমিশন হলফনামা যাচাই-বাছাই করার উদ্যোগ নিতে পারে *[আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম*, ৪৫ ডিএলআর (এডি) (১৯৯৩)]।

নির্বাচনী ব্যয়হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণঃ

নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সীমা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিগত কমিশন এ ব্যয়সীমা ১৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা করেছে। এর ফলে সাধারণ নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকলেও তারা প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আর আমাদের জাতীয় সংসদ পরিণত হয়েছে কোটিপতিদের ক্লাবে। বস্তুত আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা হয়ে পড়েছে 'বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই'। তাই কমিশনকে নির্বাচনী ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরতে হবে এবং একইসঙ্গে নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সীমা কমাতে হবে।

এই লক্ষ্যে প্রার্থীগণ প্রতিদিনি যে ব্যয় করবে তা নির্বাচন কমিশনে/রির্টানিং কর্মকর্তাদের নিকট জমা দেবে এবং নির্বাচন কমিশন তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় মনিটরিং করবে। এছাড়াও প্রার্থীরা নির্বাচনী ব্যয় পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাংক একাউন্ট খুলে (আরপিও ৪৪খ), এর মাধ্যমেই ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল অর্থ প্রদান করার যে বিধান রয়েছে তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। শুধু তাই নয় নির্বাচনের পরে (ত্রিশ দিনের মধ্যে) প্রার্থীগণ নির্বাচনী ব্যয়ের যে রিটার্ন দাখিল করেন তাও নির্বাচন কমিশনকে খতিয়ে দেখতে হবে। মিলিয়ে দেখতে হবে নির্বাচনী ব্যয়ের চূড়ান্ত রিটার্নের সাথে নির্বাচনের আগে জমা দেওয়া সম্ভাব্য খরচের বিবরণীর। প্রসঙ্গত, নির্বাচনী ব্যয়ের চূড়ান্ত রিটার্ন থেকে দেখা যায় যে, প্রায় সকল প্রার্থীর

রিটার্ন প্রায় একইরকম। নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও কমিশনে দাখিল করা রিটার্নে তা প্রতিফলিত হয় না। তাই আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা বহুলাংশে অর্থহীন টাকার খেলাতে পরিণত হয়েছে।

আমরা মনে করি, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো ও প্রচার, হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্যসমূহ ভোটারদের মধ্যে সরবরাহ এবং সকল প্রার্থীকে এক মঞ্চে এনে 'প্রজেকশন মিটিং' আয়োজনের মধ্য দিয়েও নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আশা করি, কমিশন এব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

প্রসঙ্গত, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করার এবং সেটি থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন দেওয়ার বিধান আরপিও'তে অর্ন্তভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে সংসদে আরপিওর অনুমোদনের সময়ে বিধানটিতে পরিবর্তন আনা হয়। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডকে আর তৃণমূলে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন দিতে হবে না, বোর্ডকে তা শুধু বিবেচনায় নিতে হবে। এতে তৃণমূলের মতামত উপেক্ষিত হচ্ছে এবং মনোনয়ন বাণিজ্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমরা মনে করি, তৃণমূলের থেকে প্যানেল তৈরির এ আইনি বিধানকে আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পরিশেষে, এটি সুস্পষ্ট যে, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। বস্তুত, এক্ষেত্রে কমিশনের দায়িত্ব ও ভূমিকাই সর্বাধিক। তবে এক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারের ভূমিকা অবশ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, নির্বাচনকালীন সময়ে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করলে এবং কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না দিলে, সবচেয়ে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা প্রায় অসম্ভব।

প্রবন্ধটি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত